# আল্লাহর মাস একটি বিপ্লবি মাস

অধ্যক্ষ হাফেয মোঃ আবদুল জলিল – ঢাকা
(এম এস,এম এ,বিসিএস)

পবিত্র রজব মাস আল্লাহর মাস নামে খ্যাত। এমাসেই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ্ পাক অতি নিকটে নিয়ে চাক্ষুস দীদার দান করে ধন্য করেছেন। অন্য কোন সৃষ্টিকে আল্লাহ পাক এমন দূর্লভ সাক্ষাৎ দান করেন নি। নবীজীকে লা-মাকানে নিয়ে যাওয়ার মহা আয়োজন করেছিলেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। রাব্বুল আলামীন যেমন একক, তেমনিভাবে রাহমাতুল্লিল আলামীন- নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও একক। আল্লাহ হলেন সারা জাহানের রব এবং নবীজী হলেন সারা জাহানের রহমত। আল্লাহর রবুবিয়াত এবং নবীজীর রহমত দ্বারা বিশ্বজগত পরিচালিত। দুনিয়াতে মক্কাবাসীদের নিষ্ঠুর অত্যাচারে যখন নবীজী জর্জরিত- তখনই ঘটলো মি'রাজের ঘটনা- এক মহা বিপ্লব। সুতরাং রজব হলো- আল্লাহ পাকের আয়োজনের মাস। এমাস হলো- নামাজের বিধান জারীর মাস।

রজব আল্লাহর মাস- এ কথার আর একটি তাৎপর্য হলো- এমাসের দশ তারিখে হযরত নূহ আলাইহিস সালামের সম্মানে সারা পৃথিবীকে ধ্বংস করে দিয়ে আবার নূতন করে মানব জাতির পত্তন করলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। একাধারে ছয় মাস মহা প্লাবন দিয়ে মানব জাতিকে ধ্বংস করে মহররমের দশ তারিখে হযরত নূহ আলাইহিস সালামকে ৭২ জন সঙ্গীসহ সসম্মানে পৃথিবীতে ফিরিয়ে এনে আল্লাহ পাক আবার নূতন করে মানবজাতির গোড়া পত্তন করেন। এই মহাবিপ্লবের আয়োজকও স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। উপরোক্ত দুইটি তাৎপর্যপূর্ণ বিপ্লবাত্মক ঘটনার প্রেক্ষাপটে রজবকে আল্লাহর মাস নামে অভিহিত করা হয়েছে বলে- হযরত গাউছুল আযম আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) তাঁর গুনিয়াতুত ত্বালেবীন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

ভারত উপমহাদেশে রজব মাস মুসলমানদের কাছে আর একটি বিপ্লবাত্মক ঘটনার স্মারক হিসাবে চিহ্নিত। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিন্দুস্থানে তাশরীফ আনার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন বলে ইবনে কাছির তাঁর বেদায়া ও নেহায়া গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। সে সুযোগ আর হয়নি। হুযুর (দঃ)-এর বেছাল শরীফের পর ৫৮৬ হিজরীতে নবীজীর বংশের চেরাগ হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী (রহঃ) কে তিনি হিন্দুস্তানে প্রেরণ করেন- ইসলাম প্রচার ও ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠার জন্য। খাজা গরীব নওয়াজ (রহঃ) ৫৮৬ হিজরী হতে ৬৩২ হিজরী পর্য্যন্ত ৪৬ বৎসর আজমীর শরীফকে কেন্দ্র করে ইসলাম প্রচার করতে থাকেন। নব্বই লক্ষ হিন্দু খাজা বাবার হাতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। শুধু তাই নয়- হিন্দুস্থানে স্থায়ী ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মূলেও খাজা বাবার অবদান চির স্মরনীয় হয়ে থাকবে। খাজা বাবার আগমনের দুই বৎসরের মাথায় মুহাম্মদ ঘোরী তারাঈনের যুদ্ধে খাজা বাবার দুশমন রাজা পৃথ্বিরাজকে পরাজিত করে দিল্লীতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাষ্ট ৬৬৫ বৎসর পর্য্যন্ত টিকে ছিল। অবশেষে মোগলদের ভোগবিলাস ও প্রশাসনিক দূর্বলতার কারণে ১৮৫৭ খৃষ্ঠাব্দে গোটা হিন্দুস্তান ইংরেজরা দখল করে নেয়। খাজা বাবা রাজা পৃথ্বিরাজের একটি কটুক্তির জবাবে বলেছিলেন- "আমি তোমাকে জীবিত অবস্থায় মুসলমানদের হাতে তুলে দিলাম"। খাজাবার কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হলো। ঘোর রাজ্যের বাদশাহ মুহাম্মদ ঘুরীকে খাজা বাবা স্বপ্নযোগে ভারত আক্রমনের আহ্বান জানান। ১১৯২ খৃষ্টাব্দে মুহাম্মদ ঘুরীর হাতে পৃথ্বিরাজ বন্দী হয়ে নিহত হয়। এভাবেই হিন্দুস্তানের আকাশে ইসলামের নব হিলালের উদয় হয়। তাই ভারতবাসী মুসলমানরা খাজা বাবার কাছে চিরঋণী। হযরত গাউসে পাক (রাঃ) খাজা বাবার লকব দিয়েছিলেন "সুলতানুল হিন্দ"। সুলতানুল হিন্দ খাজা বাবার বেছাল শরীফ হয়েছিল ৬ই রজব- ৬৩২ হিজরী।

# হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন হাসান চিশ্‌তী (রাঃ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

হযরত খাজা গরীব-উন-নওয়াজ বুরহানুল আশেকীন, সেরাজুস্ সালেকীন, মুরাদিল মুশতাকিন, শামসিল আরেফীন, আতায়ে রসূল, সুলতানুল আওলিয়া, রৌশনজামীর, খাজায়ে খাজেগান, পীরে পীরান, কুতুবে রব্বানী, মাহবুবে সোবহানী, হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন হাসান চিশ্‌তী সন্‌জরী সুম্মা আজমেরী (রাঃ) হযরত রসূলে খোদা (দঃ) এর পৌত্র হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর বংশধর। হযরত খাজা গরীব-উন-নওয়াজের পিতার নাম হযরত সৈয়দ গিয়াসুদ্দীন হাসান সান্‌জরী। সঞ্জরের অন্তর্গত সিস্তান নামক গ্রামে হযরত খাজা বুজুর্গ জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব ও বাক্যকাল সিস্তানেই তিনি অতিবাহিত করেন। যখন তাঁর বয়স ১৫ বছর, তখন তাঁর আব্বা পরলোক গমন করেন। মরহুম আব্বার রেখে যাওয়া সম্পত্তির অংশ যা তিনি পেলেন, তার পরিমাণ ধনী হওয়ার জন্য কম ছিল না। একদিন খাজা ইব্রাহিম কান্দুজী (রহঃ) নামের এক মজ্‌জুব (আল্লাহর প্রেমে উদাস বুজুর্গ) তাঁর আঙ্গুর বাগানে প্রবেশ করলেন। হযরত খাজা গরীব-উন-নেওয়াজ মজজুবের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদনের পর একগুচ্ছ তাজা আঙ্গুর তাঁর খেদমতে পেশ করলেন। হযরত খাজা ইব্রাহিম কান্দুজী অত্যন্ত সন্তুষ্ট চিত্তে আঙ্গুর ভক্ষণ করলেন এবং ঝুলির মধ্য থেকে কয়েকটা দানা বের করে স্বীয় দাঁত দিয়ে ভেঙ্গে হযরত খাজা বাবাকে খেতে দিলেন। তিনি দানা কয়টি খেয়ে নিলেন। খাওয়ার পরপরই তাঁর অন্তর্দৃষ্টি খুলে গেল এবং দুনিয়ার প্রতি বিতৃষ্ণা জেগে উঠলো। এরপর তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি খোদার রাস্তায় দান করে দিলেন এবং সত্যের সন্ধানে নিজের জন্মভূমি ত্যাগ করে বোখারায় চলে গেলেন। সে সময় বোখারা জ্ঞানার্জনের কেন্দ্র ছিল। সেখানে যেয়ে কিছুদিনের মধ্যেই তিনি সম্পূর্ণ কোরান শরীফ মুখস্ত করে ফেললেন। অর্থাৎ হাফেজে কোরানের মর্যাদা অর্জন করলেন। কিন্তু বেশীর ভাগ লেখকের মতে তিনি তাঁর গ্রামের মকতবে ৭ বছর বয়সেই সম্পূর্ণ কোরআন শরীফ মুখস্ত করে হাফেজ হওয়ার সম্মান রঅভ করেন। তারপর অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি ধর্মের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পথের পথিকদের অনুসন্ধানে বের হলেন। ইরাকের অন্তর্গত নিশাপুর তখন ধর্মীয় ও বিভিন্ন উচ্চশিক্ষায় প্রাণকেন্দ্র ছিল এবং এই নিশাপুরের অদূরে

হারুন নামক স্থানে তখন প্রখ্যাত কামেল বুজুর্গ হযরত খাজা ওসমান হারুনী কুদ্দেসা ছিররুহুল বারী-এর খান্‌কাহ শরীফ ছিল। হযরত খাজা বাবা এই কামেল বুজুর্গের নিকট বয়াত গ্রহণ করে ধন্য হলেন। মুরিদ হওয়ার পর ২০ বছর তিনি স্বীয় পীরের খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি ১২ বার তাঁর মুর্শেদের সাথে দেশ ভ্রমণ করেন। তখন পায়ে হেঁটে চলা ব্যতীত অন্য কোন ভ্রমণ উপযোগী বাহন ছিল না, যার জন্য সব ভ্রমণগুলোই তাঁরা পায়ে হেঁটে সম্পন্ন করেছেন। প্রত্যেক ভ্রমণের সময়েই মুর্শেদের প্রয়োজনীয় মালপত্র স্বীয় মস্তকে বহন করে নিয়ে যেতেন। খেলাফতপ্রাপ্তি ও সাজ্জাদানশীন হওয়ার পর স্বীয় মুর্শেদ হতে বিদায় নিয়ে বাগদাদের নেজামিয়া মাদ্রাসায় উপস্থিত হলেন।

পরে সরকারে দোজাহান হযরত রসূলে মকবুল (দঃ) এর নির্দেশে ৪০ জন সঙ্গীসহ হিন্দুস্থান অভিমুখে রওয়ানা হন। এ সময়ে হিন্দুস্থানে হিন্দুরাজাদের রাজত্ব এবং হিন্দু বসবাসকারীদের সংখ্যাই ছিল সবচেয়ে বেশি। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা ছিল নামমাত্র। হযরত খাজা হিন্দুস্থানে প্রবেশ করে প্রথমে লাহোরে দাতা গঞ্জেবক্‌স্ (রহঃ)-এর মাযার শরীফে চল্লিশ দিন চিল্লা করেন।

সেখান থেকে ৫৮৬ হিজরী মোতাবেক ১১৯০ খৃষ্টাব্দে সরাসরি তিনি দিল্লিতে আগমন করেন এবং কিছুদিন অবস্থান করেন। এ সময় হতেই তিনি ইসলামের প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করে ইসলাম গ্রহণের অনুরোধ জানান। হিন্দুদের নিকট এ প্রস্তাব গ্রহণ করা দুঃসাধ্য হয়ে দেখা দেয়। তারা এ প্রচারের বিরুদ্ধে তিরোধ গড়ে তুলে এবং খাজা বুজুর্গের ক্ষতি সাধনে মনোনিবেশ করে। কিন্তু স্বয়ং আল্লাহ যাঁর সহায়-মানুষ তার কি করতে পারে? হিন্দুদের মধ্য হতে একজন শক্তিশালী যুবক হুজুরকে শহীদ করার জন্য মাহফিলে প্রবেশ করে। সংগে তার তীক্ষ্ণধার এক ছোরা লুকিয়ে রেখে সামনে এগিয়ে এসে সুযোগের অপেক্ষা করতে থাকে। হুজুর তার মনোভাব বুঝতে পেরে সুধামিশ্রিত কণ্ঠে বললেন, "চুপচাপ আছ কেন? ছোরা বের করে নিজের কাজ সমাধা কর-অযথা সময় নষ্ট করে লাভ কি?" এ কথা শোনার সাথে সাথেই সে ভীত হয়ে পড়ল এবং খাজা বাবার এ অলৌকিক ক্ষমতা দেখে তাঁর প্রতি

আকৃষ্ট হয়ে পড়ল এবং নিজের কৃতকর্মের জন্য হুযুরের পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগলো। খাজা বুজুর্গ তাকে ক্ষমা করলেন। তখন সে অত্যন্ত পবিত্র অন্তরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলো। পরবর্তী সময়ে সে নিজেকে খাজা বাবার গোলামিতে আবদ্ধ করার সংকল্প ঘোষণা করলো। এ সংবাদ অতি দ্রুত হিন্দু সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো। ফলে দলে দলে বিধর্মীরা এসে হুজুরের নিকট ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে লাগলো। (আলহামদুলিল্লাহ্।)

**আজমীর গমন ঃ**

হিন্দুরাজাদের মধ্যে তখন পৃথ্বীরাজ ছিল খুব শক্তিশালী এবং তার রাজধানী ছিল আজমীরে। খাজা গরীব-উন-নেওয়াজ তাই দিল্লি ছেড়ে আজমীর অভিমুখে রওয়ানা হলেন এবং যথাসময়ে আজমীর পৌঁছে প্রথমেই পৃথ্বীরাজকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানালেন। কিন্তু এ সৌভাগ্য তার ললাটে ছিল না। তাই সে ঈমানও আনল না বরং পাল্টা আক্রমণ, নির্যাতন ও নানা প্রকার অসুবিধায় ফেলার জন্য যা যা করা দরকার তার কোন কিছুই বাকি রাখল না। প্রথম প্রথম ক্ষুদ্র শক্তি প্রয়োগে কাজ না হওয়ার পরে শাদী দৈত্যকে খাজা বাবার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলল এবং শাদী দৈত্য বিরাট বিরাট পাথর পাহাড়ের ওপর থেকে খাজা বাবার মজলিসের উপর নিক্ষেপ করতে লাগলো। কিন্তু খাজা বাবার ইশারায় পাথরগুলো দূরে গিয়ে পড়তে লাগলো। শাদী দৈত্য কোন ক্ষতি সাধনই করতে পারলো না। এত বড় শক্তিশালী দৈত্যকে নিয়োগ করেও যখন রাজা কোন সুবিধা করতে পারলো না তখন হিন্দুস্থানের সর্বশ্রেষ্ঠ যাদুকর স্বীয় ভ্রাতা জয়পাল যোগীকে ডেকে পাঠালো। জয়পালের ছোট হতে বড় বড় সব যাদু যখন বিফল হলো তখন সে তার সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ যাদু অগ্নিবান প্রয়োগ করলো কিন্তু তবু কোন কাজ হলো না। জয়পাল অস্থির হয়ে উঠল এবং চিন্তা করতে লাগল-এ লোক কোন্ শক্তির অধিকারী, যার জন্য এ বিদেশীদের সামান্যতম ক্ষতিও সে করতে পারলো না? তখন জয়পালের স্থির বিশ্বাস হলো-খাজা বুজুর্গ নিশ্চয়ই অলৌকিক-ঐশী শক্তির অধিকারী যা অন্য কোন ধর্মাবলম্বীদের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়। কেননা, সে জানতো যে সারা ভারতবর্ষে এমন কোন শক্তিধর যোগী-তাপস নেই যে, তার একটিমাত্র যাদুর মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে। যার অগ্নিবাণ নিক্ষেপে পাথর পর্যন্ত জ্বলে যায়, অথচ এ কোন্ শক্তি বলে বলিয়ান যার কাছে সমস্ত যাদুই ধুলিস্যাৎ হযে গলো; সমস্ত ব্যাপারটা বুদ্ধি করতে পেরে

জয়পাল গরীব নেওয়াজে মজলিসে প্রবেশ করলো এবং খাজা বাবার হাতে ইসলামের নিকট আত্মসমর্পণ করলো। ইসরঅম গ্রহণ করার পর জয়পাল আবদুল্লাহ নাম গ্রহণ রে নিজেকে খাজা বুজুর্গের একজন প্রধান খাদেম হিসেবে নিয়োজিত রাখার সৌভাগ্য অর্জন করলেন। জয়পালের যোগসাধনার পেছনে উদ্দেশ্য ছিল অমরত্ব লাভ করা। খাজা গরীব-উন-নওয়াজ তার মনের অভিপ্রায় জানতে পেরে রাব্বুল আলামিনের দরবার হতে তার এ প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়ে আনলেন। তখন হতে তার মর্যাদা হলো "খিজিরে বিয়াবান" (বন জঙ্গলের খিজির) এবং বিয়াবান শব্দটি নামের সাথে যুক্ত হয়ে নাম হলো আবদুল্লাহ বিয়াবানী। এরপর হতে তিনি আবদুল্লাহ্ বিয়াবানী নামেই খ্যাত। ভারতের অন্তর্গত মধ্যপ্রদেশের কুরুপান্ডবে অবস্থিত একটা পাহাড়ী জঙ্গল (সেটা এখন আবদুল্লাহ বিয়াবানের জঙ্গল নামে পরিচিত), সেখানে তাঁর আস্তানাকে কেন্দ্র করে প্রতিবছর ফাল্গুনে বিরাট উরুছ হয় এবং প্রথম বৃহস্পতিবার ফাতেহা হয়।

**পৃথ্বীরাজের ধ্বংস ঃ**

পৃথ্বীরাজের সমস্ত লোকজন ঈমান আনলেও পৃথ্বীরাজ কিন্তু ঈমান আনল না। অবশেষে খাজা বুজুর্গ দুঃখিত হয়ে পৃথ্বীরাজকে লখে পাঠালেন, "মা তুরা জিন্দাহ বমুসলমানানে সপরদেম।" অর্থ-আমরা জীবিত বন্দী অবস্থায় তোমাকে মুসলমানদের হাতে অর্পণ করলাম।" এ চিঠি দেয়ার পরপরই সুলতান শাহাবুদ্দীন মোহাম্মদ ঘোরীর সাথে ১১৯২ খৃষ্টাব্দে পৃথ্বীরাজের যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ জীবিত বন্দী হয়। পরে তাকে হত্যা করা হয়। পৃথ্বীরাজকে পরাজিত ও নিহত করে ভারতবর্ষে ইসলামী শাসন কায়েম করা হয়- যা ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল। এরপর ইংরেজরা পূরা ভারতবর্ষের একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে বসে এবং ৯০ বৎসর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ দুইভাগে বিভক্ত হয়ে দুটি রাষ্ট্র গঠিত হয়- ভারত ও পাকিস্তান। এভাবে হিন্দুরা তাদের নিজস্ব রাষ্ট্র পূনঃ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।

খাজা বাবা জীবনের ৪৬ বছর হিন্দুস্থানের মাটিতে স্রষ্টার সৃষ্টিকে সঠিক পথে নিয়োজিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। লক্ষ লক্ষ বিধর্মী নরনারী স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে ইসলামের মহানুভবতায় মুগ্ধ হয়ে হযরত খাজা বুজুর্গকে পাওয়ার আশায় তাঁর হাতে হাত রেখে ইসলামের প্রতি ঈমান এনে মুসলমান হয়েছে এবং হযরত খাজা বাবার গোলামি লাভ করে গৌরবান্বিত হয়েছে।

৬৩৩ হিজরীর ৬ই রজব রোববার দারুল খায়ের, আজমীর শরীফে হযরত খাজা বুজুর্গ ইহলোক ত্যাগ করেন (তাঁর বেসাল শরীফ অর্থাৎ মহামহিমের সাথে মহামিলন ঘটে) রুহ মোবারক দেহত্যাগ করার পর তাঁর পেশানী মোবারকে (ললাটে) নূরের অক্ষরে লেখা ছিল "মাতা হাবীবুল্লাহ ফি হুব্বিল্লাহ" অর্থাৎ খোদার প্রেমে খোদার বন্ধু বিদায় নিল। তিনি তিন সাহেবজাদা-খাজা ফখরুদ্দীন, খাজা হেসামুদ্দীন ও খাজা যিয়াউদ্দীন এবং এক সাহেবজাদী হাফেজা জামালকে রেখে যান।

রওজা মোবারক আজমীর শরীফের দারুলখায়েরে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল দর্শনপ্রার্থীদের জন্য আজও উন্মুক্ত রয়েছে। আল হামদুলিল্লাহ আলা জালেক।